আত্মগঠন

بناء النفس

< بنغالي >

খালিদ ইবন আব্দুল আযীয আবাল খায়ল

خالد بن عبد العزيز أبا الخيل

অনুবাদক: ইকবাল হোছাইন মাছুম

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: أقبال حسين معصوم

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

আত্মগঠন

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿ بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ ١٤ وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ١٥ ﴾ [القيامة: ١٤، ١٥]

"বরং মানুষ তার নিজের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৪-১৫]

আল্লামা ইবন কাছির রহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিটি মানুষই নিজের ব্যাপারে সাক্ষী, নিজ কর্ম সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, অস্বীকার করুক কিংবা অজুহাত পেশ করুক।[1]

আয়াতের মাধ্যমে একটি বিষয় প্রমাণিত হলো যে, ব্যক্তির অন্তরের গোপন বিষয়াদি সম্বন্ধে আল্লাহর পর তার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। সেসব বিষয়ে আল্লাহর পর সর্বাধিক পরিজ্ঞাত ব্যক্তি সে নিজেই।

তাইতো মানুষের কাছে শরী'আতের চাহিদা হচ্ছে, মানবাত্মা একান্ত অনুগত হওয়া অবধি মানুষ তার পরিচর্যা ও শাসন করে যাবে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। বিষয়টি নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় যে, সকলের পক্ষে তাতে সফল হওয়া সম্ভব বরং খুবই কঠিন। অবাঞ্ছিত সব যাতনা ও কষ্টে ভরা দীর্ঘ রাস্তা, যার সত্যতা মিলে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩]

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের পথসমূহের দিশা দিব।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ৬৯]

আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর শর্ত আরোপ করেছেন দুটি:

এক. আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সর্বাত্মক পরিশ্রম করা, আত্মাকে কঠোর সাধনা-সংগ্রামে নিয়োজিত রাখা এবং শাসনের মাধ্যমে তাকে সুগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা।

দুই. এই সব কিছুই হতে হবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, সুখ-ঐশ্বর্য্য অর্জন কিংবা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

এর রহস্য বোধ করি এটিই, (আল্লাহ ভালো জানেন) সঠিক পথের হিদায়াত এবং অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর রাস্তা প্রাপ্তি এমন এক বিশাল অর্জন যা আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদেরই দান করেন যারা এর প্রত্যাশা করে এবং চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে প্রত্যাশার সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করে।

এ প্রবন্ধে আমরা কিছু কার্যকর পন্থা ও উপাদান অনুসন্ধানের চেষ্টা করব, আল্লাহর তাওফীকের পর যার মাধ্যমে বান্দা নিজ আত্মাকে একটি ঈমানী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হবে আর এতেই তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি নিশ্চিত হবে।

[1] তাফসির ইবন কাসীর ৪/৪৪৯

সেসব উপাদানের কিছু আছে যা অর্জন করতে হবে আর কিছু আছে যা বর্জন করতে হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পেয়েছি, বরণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করার আগে বর্জনীয় বিষয়াদির আলোচনা অধিক কার্যকর। তাই সেই পদ্ধতিরই আমরা অনুসরণ করছি:

আত্মগঠনের ক্ষেত্রে বর্জনীয় বিষয়াদি:

১. আত্মম্ভরিতা পরিহার ও আত্মার অদৃশ্যমান দোষত্রুটি ত্যাগ করা: আর এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ আত্মভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা দোষগুলোকে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে রেখেছেন, এটি বান্দার প্রতি তাঁর অপার করুণা। মানুষের মুখে প্রশংসা শোনে মানবাত্মা যখন দম্ভ-অহঙ্কারে উদ্বেলিত হয় তখন এ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, এসব ক্ষেত্রে আমি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. থেকে অভূতপূর্ব আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি, যা আর কারো মধ্যে দেখি নি। তিনি বেশি বেশি বলতেন,

ما لي شيء ، ولا مني شيء ، ولا فيّ شيء.

"আমার কিছু নেই, আমার পক্ষ থেকেও কিছু হয়নি এবং আমার মাঝেও কিছু নেই।"

তাঁর সম্মুখে প্রশংসা করা হলে বলতেন,

والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعدُ إسلاما جيدا.

"আল্লাহর শপথ আমি এখনো প্রতি মুহূর্তে আমার ইসলামকে সংস্কার ও নবায়ন করি। এখনো পর্যন্ত আমি ভালো মানের ইসলাম গ্রহণ করতে পারি নি।"[2]

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, শাইখুল ইসলামের ব্যক্তিত্বের বিশালতাটি কল্পনা করুন। স্মরণে আনুন তাঁর সংগ্রামময় সোনালী জীবনকে। জীবনে শত শত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি এবং প্রতিবারই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের হতাশ করে বিজয় মালা ছিনিয়ে এনেছেন। জীবদ্দশায় সুধী ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে কত প্রশংসা ও অভিবাদন পেয়েছেন তিনি। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও জ্ঞানের বিশালতার কথা অকপটে স্বীকার করেছে বার বার। এবার নিজ সম্বন্ধে তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্য সম্পর্কে বিচার করুন। চিন্তা করে দেখুন, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে নিজকে কত সুন্দরভাবে গঠন করতে পারলে এমন মন্তব্য করা যায়। জ্ঞান ও কর্মে উচ্চাসনে আরোহনের এটি একটি অন্যতম উপাদান।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! যখন প্রমাণিত হলো যে, আপনার সম্বন্ধে আপনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। আপনার ভিতরে কী আছে সেটি আপনার চেয়ে অন্য কেউ বেশি জানে না? তাই আপনাকে সতর্ক হতে হবে, এমনও দিন আসবে, লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে এবং এমনও হতে পারে জনসমুদ্রের সামনে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রশংসা হবে। পক্ষান্তরে এমন দিনও আসতে পারে যে, লোকেরা আপনার নিন্দা জ্ঞাপন করবে। দুর্নাম ছড়াবে। আপনার মর্যাদা হানি করবে। তবে আপনার বিশ্বাস থাকা উচিত, প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই কেয়ামতের দিন আপনার পাল্লা ভারি করবে না; বরং আপনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা, মানসিক পঙ্কিলতা, অন্তরের সুপ্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে কিয়ামতের দিন আল্লাহ

[2] মাদারেজুস সালেকীন:১/৫২৪

আপনার হিসাব নিবেন। সুতরাং মানুষ আপনাকে কেমন জ্ঞান করল সেটি বিবেচ্য নয়। আপনি কেমন, কেমন আপনার অন্তর সেটিই বিবেচ্য। তাই লোকেরা আপনাকে সম্মান করে -এর ওপর ভিত্তি করে আপনিও নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করা শুরু করবেন না। মানুষ যতই আপনার প্রশংসা করুক, বাস্তবতা কখনো বিঃস্মৃত হবেন না। মানুষের প্রশংসার ওপর আপনার বিচার হবে এমন আত্মপ্রবঞ্চনায় পতিত হবেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন হাযম রহ.-এর একটি কথা বড়ই চমৎকার, নিজ দোষ-ত্রুটি গণনা করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন।

বলেছেন, আমার দোষের মাঝে একটি ছিল 'তীব্র আত্মম্ভরিতা'। আমার বিবেক আত্মার সেসব দোষ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হয়ে তার সাথে বিতর্কে জয়ী হয়। আর তাকে চরমভাবে পরাভূত করে ধরাশায়ী করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে আত্মম্ভরিতা সমূলে বিদায় নেয়। আল্লাহর শোকরিয়া, এমনভাবেই বিদায় নেয় যে, সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে নি। এরপর থেকে আত্মা নিজেকে ছোট জ্ঞান করে বিনয়ী আচরণ করতে শুরু করে।[3]

সালাফে সালিহীন রহ. দীন সম্বন্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মানুরাগের কারণে খ্যাতি ও প্রশংসা কুড়ানোর মজলিসকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতেন।

আল্লামা ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, আমাকে সুফিয়ান রহ. বলেছেন, খ্যাতির অনুরাগ থেকে সতর্ক থাকো। যাদের কাছেই আমি গিয়েছি প্রত্যেকেই খ্যাতির লোভ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করেছেন।

আল্লামা বিশর আল হাফি রহ. বলেন, যার ভিতর খ্যাতির লোভ আছে তার মাঝে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া নেই।

তাইতো দাওয়াত কর্মীদের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ পিচ্ছিল জায়গার ভয়াবহতা থেকে সতর্ক থাকা এবং দাওয়াত কর্মে সৎ উদ্দেশ্য লালন করা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য।

এ উদ্দেশ্য পতনের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, দা'ঈর অন্তরে ভক্ত ও অনুরাগী বানানো এবং সম্মান ও সমাদর প্রাপ্তির স্পৃহা জাগ্রত হওয়া।

২. **অতিরিক্ত মেলা-মেশা ত্যাগ করে নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করা:** আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, চারটি কাজ প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে এর মাধ্যমে অন্তর কঠোর ও শক্ত হয়ে যায়: আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা ও মেলামেশা।[4]

এসব কাজ বিনা প্রয়োজনে কিংবা অধিকহারে করতে থাকলে অন্তর শক্ত হয়ে মরে যায়। তিনি সত্যই বলেছেন, অন্তরের শুদ্ধতা ও আত্মার কল্যাণের জন্য নির্জনতার চেয়ে অধিক ফলদায়ক আর কিছু নেই। তবে এই নির্জনতা ও একাকীত্ব হবে ন্যায়সঙ্গত ও পরিমিত। কর্তব্য সম্পাদনের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কিংবা দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়।

একজন দা'ঈ ও মুরুব্বির জন্য -আলোচিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত- নির্জনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্জনতা দা'ঈকে নিজের হাকীকত সম্বন্ধে অনুধাবন করার ফুরসত দেয়। মানুষের শোরগোল ও তার বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[3] মুদাওয়াতুন নুফূস: ১/৩৫৪

[4] আল-ফাওয়ায়েদ:পৃ ৯৭

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ﴾ [سبا: ٤٦]

"বলো, আমি তো তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সাথীর মধ্যে কোনো পাগলামী নেই।" [সূরা সাবা, আয়াত: ৪৬]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ কুরাইশ কাফির ও যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে মানুষের ভীড় ও শোরগোল থেকে পৃথক হয়ে একাকী কিংবা দু'একজন সাথীর সঙ্গে নির্জনে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। এতে তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবে। এর কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি সার্বক্ষণিক মানুষের সাথে মেলামেশায় মত্ত থাকে আস্তে আস্তে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেতে থাকে এবং পানি যেমন পঁচে যায় তেমনি তার বোধ-বুদ্ধিতেও পঁচন ধরে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় চিন্তা শূণ্য হয়ে যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্থির এবং জটিল মুহূর্তের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ফায়েদা:

নুয়াইম ইবন হাম্মাদ রহ. বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. তাঁর অধিকাংশ সময় ঘরে বসেই কাটাতেন। তাঁকে বলা হলো, এতে আপনি একাকীত্ববোধ করেন না? উত্তরে তিনি বলেছেন, একাকীত্ববোধ করব কেন, আমিতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের সাথে সময় অতিবাহিত করি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ.-এর একজন নিকটাত্মীয় আমাকে বলেছেন, শায়খ তাঁর (বিপদ সঙ্কুল, সংগ্রামী) জীবনের প্রথম দিকে আপতিত বিপদের তীব্রতার কারণে কিছু সময় একাকীত্বে কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে নির্জন প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তেন। একদিন আমি তার পিছু নিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, প্রান্তরে গিয়ে তিনি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন এবং লায়লার মজনুকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত এক কবির নিম্নোক্ত পংক্তি নিজেকে উদ্দেশ করে আবৃত্তি করলেন,

وأخرج من بين البيوت لعلني   أحدث عنك النفس بالسر خاليا.

"জনপদ থেকে বের হয়ে আসি, তোমায় নিয়ে নির্জনে নিজের সাথে কিছু বলার আশায়।"

নিশ্চয় এটি বড়ই চমৎকার একটি দৃশ্য। আপন স্রষ্টার তরে বান্দার অনুরাগ-ভালোবাসা এমন স্তরে পৌঁছলে নির্জনে তাঁর সম্মুখে নিজ অন্যায়-অপরাধ স্বীকার করে তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ করে। যিকিরের মাধ্যমে তাঁর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এ নির্জনতাগুলো যুগে যুগে উম্মতকে রব্বানী ও হক্কানী বহু নেতা উপহার দিয়েছে। যারা উম্মতকে তাদের কর্তব্য পালন ও রবের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়ে তাদের শান বুলন্দ করণে নিজেদেরকে শতভাগ উজাড় করে নিরত রেখেছেন আমৃত্যু। আর নিজ স্বার্থ ও আত্মচাহিদা পূরণ করা থেকে মুক্ত থেকেছেন পূর্ণ সফলতার সাথে।

এখান থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি ভারী বাণী ধারণ এবং তার জন্য ত্যাগ ও কুরবানি করার প্রস্তুতি গ্রহণ কল্পে হেরা গুহায় আপন রবের সান্নিধ্যে নির্জনতা অবলম্বনের তাৎপর্য বুঝে আসে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. মেলামেশাকে চমৎকার দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। বলেছেন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্মেলন দুই প্রকার:

এক. সময় কাটানো ও অন্তরের বিনোদনের জন্য সম্মেলন। এ জাতীয় সম্মেলনে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। সর্ব নিম্নস্তরের ক্ষতি হচ্ছে, এতে সময় ও অন্তর বিনষ্ট হয়ে যায়।

দুই. নেক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের উদ্দেশে সম্মেলন। এ জাতীয় সম্মেলন জীবনের একটি লাভ জনক ও বিশাল প্রাপ্তি। তবে এতে তিনটি আশংকা রয়েছে।

(ক) একে অপরকে দেখানোর জন্য নিজেকে শোভিত করা।

(খ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেলামেলা ও গল্প করা।

(গ) সম্মেলন ও আড্ডা অভ্যাসে পরিণত হওয়া, যা উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

আত্মগঠনে বরণীয় বিষয়াদি

আত্মগঠন ঈমানি অবকাঠামোয় সুসম্পন্ন হবার নিমিত্তে আমরা এখানে চারটি বিষয় উল্লেখ করব। বস্তুচতুষ্টয়ের অনুবর্তনের মাধ্যমে আত্মগঠন ঈমানি চেতনায় সমৃদ্ধ হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিষয়গুলো হলো,

১. গোপনীয়তা রক্ষা করে অধিক পরিমাণে আমল করে যাওয়া। আর লোক চক্ষুর অন্তরালে সম্পাদিত আমলই আল্লাহর মুহব্বতের সত্যতা প্রমাণ করে। একজন মুসলিমের যে গুণটি অবধারিতভাবে থাকতে হয় অর্থাৎ ইখলাস, গোপনীয়তার সাথে সম্পাদিত আমল সেই ইখলাসের বিদ্যমানতার পরিচায়ক। জনৈক মনীষী বলেন, "গোপন আমলের চেয়ে নফসের ওপর অধিক ভারি ও কষ্টকর আর কিছু নেই। কারণ, এতে তার কোনো অংশ থাকে না।"

গোপন আমলের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন,

ক. সকল নেক আমলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির অবস্থা ইখলাস ও আল্লাহর মুহব্বত প্রমাণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ, তার ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায়, দৃঢ়তা ও অবিচলতার বিরাট এক পুঁজি সঞ্চয় করে নিয়েছে সে। যা বিশেষ করে বিপদ ও মুসিবতের দিনগুলোতে বিশাল কাজ দেবে।

খ. গোপন আমলকে মানদণ্ড ও পাল্লা বিবেচনা করা হয়, যে পাল্লার মাধ্যমে বান্দা তার আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তার বিশুদ্ধতাকে পরিমাপ করতে পারে। সুতরাং একজন মুসলিম যখন বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে নিজের মাঝে উদ্যম ও শক্তির উপস্থিতি দেখতে পায়। আর এর বিপরীতে গোপন আমলের ক্ষেত্রে অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব করে, তাহলে তাকে সতর্ক হয়ে যেতে হবে এবং নিজ নফসকে অভিযুক্ত করে শুধরানোর রাস্তা বের করতে হবে। তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, যে রাস্তায় সে চলমান তা বিচ্ছুতি ও বিপদ হতে পরিপূর্ণ নিরাপদ নয়।

গ. অন্তরে ইখলাসের বৃক্ষকে জীবন্ত করা। আর ঐ বৃক্ষকে উন্নত, বৃদ্ধি, শক্তিশালী ও সজীব করার ক্ষেত্রে গোপন আমলের মত আর কোনো কিছু নেই।

২. ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহর আশ্রয়ের দ্বারস্থ হওয়া ও তাঁর সম্মুখে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে নিজ আত্মাকে অভ্যস্ত করে তোলা। বান্দার এ ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যে নেই, এটি দিবালোকের মত সত্য। তবে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, সাধারণ মানুষ; বরং বিশেষ ব্যক্তিবর্গরাও এ বিষয়ে খুবই গাফেল ও অমনযোগী। বিপদে পতিত হলে তাদের দেখতে পাবেন আল্লাহর দরজা ব্যতীত সকল

দরজায় কড়া নাড়তে। সকল জায়গায় ধর্ণা দিবে কেবল আল্লাহর নিকট আসবে না। আর তাঁর দ্বারস্থ যদি হয়ও তবে মনে অনেক সংশয় নিয়ে, বিপদ দূর হবে এমন বিশ্বাস মনে আনতে পারে না। অথচ মানুষের উচিত, বেশি বেশি আল্লাহর দ্বারস্থ হওয়া। তাঁর কাছে নিজেকে বার বার সমর্পণ করা এবং এই ব্যাপারে নিজেকে ছোট মনে না করা, হীনমন্যতায় না ভোগা। কারণ আল্লাহ তা'আলা পরম দাতা, অতিশয় দয়ালু। প্রার্থনাকারীর কোনো প্রার্থনাই তাঁর নিকট ভারী নয়। বান্দা যদি প্রার্থনাতে আন্তরিক সততার পরিচয় দেয়। একেবারে উপায়হীন অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, কেবল আল্লাহ তা'আলাই বিপদ দূর করতে পারেন, তিনি ব্যতীত আর কারো ক্ষমতা নেই। তখনই কেবল সেই মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর কাছ থেকে স্বস্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে যার হাতে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। যার নিমিত্তে সব কিছু সম্পাদিত হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, "বিতাড়িত হলেও দরজায় অবস্থান করাকে লজ্জার মনে করবে না। প্রতাখ্যাত হলেও ওযর-আপত্তি করাকে বাদ দিবে না। দরজা যদি গৃহীতদের তরে উন্মুক্ত করা হয় তাহলে তুমি মিথ্যুকদের ন্যায় ভীড় করবে এবং অযাচিত-অবাঞ্চিতদের ন্যায় প্রবেশ করবে।"[5]

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে বান্দার বন্ধন যেসব জিনিসের মাধ্যমে দৃঢ় হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, আল্লাহর আসমা ও সিফাত তথা নাম ও গুণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা। সেসব আসমা ও সিফাতের অর্থ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা। তার প্রভাব ও আনুষঙ্গিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এর মাঝে বান্দার সাথে সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে মহান সৃষ্টাকর্তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবার ক্ষেত্রে দারুন প্রভাব রয়েছে।

ফায়েদা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, চিন্তাশীল ও সত্যনিষ্ঠ সালিকিনদের একটি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সব সময় অধিক পরিমাণে يا حيّ يا قيوم لا إله إلا أنت পাঠ করবে, এটি তার অন্তর ও বিবেককে জীবন্ত করে তুলবে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. এ কালিমাটির প্রতি তীব্রভাবে আকর্ষণ বোধ করতেন। সব সময় পড়ার মাঝে থাকতেন। তিনি আমাকে একদিন বললেন, অন্তর জীবন্ত করণে এ কালিমা দুইটির বিরাট প্রভাব রয়েছে।[6]

৩. সার্বক্ষণিক ও সর্বাবস্থায় যিকিরের উপর থাকা। যিকিরকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা যে, একটি মুহূর্তও যেন যিকির বিহীন অতিবাহিত না হয়। যিকির অন্তরের প্রশান্তি আনয়ন করে। অন্তরে দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

"জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

বরং যিকিরকে বিপদ-আপদে দৃঢ় থাকার সবচে বড় মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥﴾ [الانفال: ٤٥]

---

[5] আল-ফাওয়ায়েদ: পৃ: ৫১

[6] আল-ওয়াবিলুস সাইয়েব: পৃ. ৬২

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর, যাতে তোমরা সফল হও।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৫]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, যিকিরের উপকারিতার মাঝে একটি হচ্ছে, যিকির অন্তর ও আত্মার শক্তি। বান্দা যদি যিকির শূন্য হয়ে যায় তাহলে সে প্রাণহীন শরীর সদৃশ হয়ে যাবে। (তিনি বলেন) একবার আমি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার নিকট গেলাম, তিনি ফজরের সালাম আদায় করে যিকিরে বসেছেন। প্রায় অর্ধদিন আল্লাহর যিকিরে অতিবাহিত করার পর আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললেন। এটি আমার দিনের খাবার। যদি খাবার গ্রহণ না করি তাহলে আমার শক্তি পড়ে যাবে। (অথবা এর কাছাকাছি কোনো কথা বলেছিলেন)

একদিন আমাকে বললেন, আমি কেবল আত্মাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই যিকির থেকে সামান্য সময় বিরত থাকি এবং এর মাধ্যমে নতুন আরেকটি যিকিরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। (অথবা এর কাছাকাছি কোনো কথা বলেছিলেন)

৪. সারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করে তার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং খুব সুক্ষ্মতার সাথে তা সম্পন্ন করা। এর মাধ্যমে আমরা নেতিবাচক ও অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকতে পারব আর সুশৃংখল ও ইতিবাচক কাজের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারব। পাশাপাশি সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারব।

আত্মা যদি পরিকল্পিত লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোনো দিকে ধাবিত না হয়। গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর তা সাধন করাই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয় তাহলে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে মনে এক অনুভূতির সৃষ্টি হবে। উদ্দেশ্যহীন কাজে দীর্ঘ সময় নষ্ট হওয়ার কারণে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। অহেতুক মজলিসের প্রতি সৃষ্টি হবে তীব্র ঘৃণা আর ভাল ও কল্যাণমূলক মজলিসের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ। এটি বাস্তবিকপক্ষেই অতি উচ্চ মানের একটি স্তর, যা অর্জন করার প্রতি আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে আত্মা গঠনে সচেষ্ট হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত